এসো এসো, এসো প্রিয়ে...

"রবিকাকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন 'বিয়ে করো-বিয়ে করো রবিকাকা রাজী হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজী করালেন।"

(স্মৃতিকথা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রিয় বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভ লগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে, উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।

অনুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রবীন্দ্র বিবাহের আমন্ত্রণলিপি)

বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড় কুলে খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল ভাঁড় খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোটো কাকিমা ত্রিপুরা সুন্দরী বলে উঠলেন, ওকি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড় গুলো সব উলটে পালটে দিচ্ছিস কেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি—নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

'জানো না কাকিমা—সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর : হেমলতা দেবী

উপরের তিনটি উদ্ধৃতিতে ভর করে কেন আমরা 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের আলোচনার সূত্রপাত ঘটালাম, তা স্বাভাবিক পাঠকের বিস্ময়ের কারণ ঘটাবে। লক্ষণীয়, এই তিনটি উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবনকে কেন্দ্র করেই বললে ভুল হবে, রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ ঘটনার সূত্র ধরেই এদের বিচরণ। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের বিয়ে, মহাজীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ বাঁক। প্রথমটি থেকে উঠে আসে বিয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা বা এড়িয়ে যাওয়া যা বিয়ের প্রসঙ্গে পুরুষের লজ্জার অতিরিক্ত কিছু। অবনীন্দ্রনাথের 'বিয়ে আর হয় না' 'কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঠাকুরবাড়ীর পরিশীলিত আবহাওয়ার সাপেক্ষেও রবীন্দ্রনাথের বিয়ে বিলম্বিত। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় চব্বিশ বছর বয়সে যা তাঁর দাদাদের বিয়ের বয়সের তুলনায়

বেশ বেশি। বিয়ের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স ১৯ বৎসর ২ মাস। সত্যেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় সতেরো বছর বয়সে (কবিমানসী : আবির্ভাব)। বড়দাদাদের তুলনায় এই বিলম্বিত লয়ের কারণ বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। যাঁর মন জুড়ে আছেন 'জীবনের ধ্রুবতারা' বৌঠান কাদম্বরী তাঁর পক্ষে অন্য নারীর সঙ্গে জীবনে জীবন যোগ করা কঠিন বটেই। কিন্তু 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব' গেয়ে উঠে সব কিছু ভাসিয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে কি স্বভাবে কি সমাজবাস্তবে সম্ভব নয়।

তাই অগত্যা বিয়ে মেনে নেওয়া। হেমনলিনীকে কিছু বলে উঠতে না পারলেও রমেশের মন জুড়ে ছিল সে। আবার পিতার আহ্বান সপাটে ফেরানোর সাধ্য ও তার ছিল না। রমেশ-হেমনলিনীর বিয়ে বাস্তবে সম্ভব ছিল, কিন্তু বাবাকে সে কথা বলা হয়ে ওঠে না রমেশের। রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর মিলন সম্ভাবনা বাস্তব ছিল না তবু ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়ালেও তাঁর নিজের জীবনের এই অপূর্ণতার রেশ তিনি সঞ্চারিত করলেন রমেশের জীবনে। উপন্যাসে নলিনাক্ষ-কমলার মিলনের পরে রমেশ-হেমনলিনীর মিলন সম্ভাবনা অলীক ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পথে যান নি এবং এই না যাওয়ার কারণ সম্ভবতঃ তাঁর নিজের জীবনের বাস্তবের রেশ যা এই উপন্যাসের কাহিনীতে সংগোপনে মিশে গেছে। তাই ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ যে হেমনলিনীকে চিঠিতে লিখবে :

> সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ।

সত্যি, রমেশ যেমন কমলা এবং হেমনলিনীকে হারালো এবং হৃদয়ে পেলো তেমনি রবীন্দ্রনাথও অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারালেন হেমনলিনীরূপী কাদম্বরী এবং কমলারূপী মৃণালিনীকে। রয়ে গেলেন রমেশের মত ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান হয়ে, যিনি ঘরেও নেই, পারেও নেই, দিনের আলো ফুরোলেও যাঁর সাঁঝের আলো জ্বলে না, অশ্রু ফেলতেও যাঁর হাসি পায়!

উৎসাহ, আগ্রহ না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করেছিলেন, করেছিলেন সকৌতুকেই। বিয়েটা তাঁর কাছে দুর্ঘটনাই ছিল যার objective corelative হিসাবে ধরা যায় নৌকাডুবি কে। বিয়ে যেন তাঁর কাছে একধরনের 'world upside down' যা, মাথায় রেখেই ভাঁড় খেলতে গিয়ে সবই উল্টে দেন, মুখে জানান 'আজ যে সব উলট পালট হয়ে যাচ্ছে'। এরপর গান গাইতে অনুরোধ করলে তিনি নববধূর দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে গান ধরেন 'ও কি স্থির সৌদামিনী'। লক্ষণীয়, নিজের লেখা গানের বদলে তিনি ধরেছেন সম্ভবত বৌঠানের পতিদেবতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান যার কিছু গূঢ় তাৎপর্য থাকা বিচিত্র নয়! বিয়ে নামক ওলট পালটের সূত্র ধরে যখন বৌঠানের বদলে এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা নাবালিকা তাঁর জীবনে জড়িয়ে গেলো তখন তিনিও ধরলেন যে গান বৌঠানের তাঁর স্বামীর কাছে শোনার কথা। অর্থাৎ 'ওলট-পালোট'কে আরো জমিয়ে দিচ্ছেন তিনি। বস্তুতঃ নিজের দুঃখ নিয়ে এই কৌতুক রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ও লেখনী সংগত। তাই বৌঠানের মৃত্যুর পর তিনি লিখতে পারেন 'সরোজিনী প্রয়াণ'র মতো কৌতুকাবহ রচনা। তিনিই লিখতে পারেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিমায়:

মরণের বাড়া আর তো তামাসা নাই। কাঁদিলেই তো আমাদের হার হইল, এত বড় একটা ঠাট্টা যখন ধরা পড়িল, তখন তো আমাদেরই জিত। জীবনের সিংহাসনের উপর জরি-জড়ানো মছলন্দ পাতিয়া আমাদেরকে পুতুলটির মত সমস্ত দিন কে বসাইয়া রাখিয়াছে, অবশেষে সন্ধ্যাবেলাটিতে মছলন্দ খানি তুলিয়া দেয়, দেখা যায় খানকতক চিতার কাষ্ঠ—এই তো পরিহাস; এই জন্যই তো এত বিরাট অট্টহাস্য। আমরাও হাসিতেছি—হাঃ হাঃ হাঃ!

(বিচিত্র প্রবন্ধ। ভারতী।)

নিমন্ত্রণের চিঠিতেও এই কৌতুকময়তা স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তাঁর পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করছেন আবার করছেনও না! নিমন্ত্রণের চিঠির উপরে ছাপার অক্ষরে লেখা 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল, লভিনু হায় এবং তার পাশেই কালি দিয়ে লেখা' 'আমার motto নহে'। মধু কবির মতো সবভেঙে বেরিয়ে গিয়ে পরে আত্মবিলাপ তাঁর পোষায় না। তিনি অন্য পথের পথিক। তিনি নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন, একজন বাইরে দাঁড়িয়ে, একজন বিয়েতে জড়িয়ে। নিজেকে এই ভাগ করে ফেলার বিষয় রবীন্দ্রনাথের রচনায় এসেই গেছে যার একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ 'যে আমি' ওই ভেসে চলে গানটি। নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে দুটি চরিত্র নির্মাণের বিষয় এই উপন্যাসেও এসেছে যার উন্মোচনে আমরা যথাসময়ে এগোবো। আপাততঃ এটুকুই বলা যে রমেশও দ্বিধাবিভক্ত হয়েই বিয়ের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে ছিল।

তবু রমেশের 'ভুল' দাম্পত্যজীবনে মাধুর্যের অভাব ঘটেনি, যেমন হেমনলিনীকে ভুলতে পারে নি সে, ভুলতে পারে নি কমলাকেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অন্তরের কবি',র তিরোধানের বহুদিন পরেও বৌঠান কে মনে করে যেমন লিখেছিলেন 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা' তেমনি পত্নী বিয়োগের প্রায় বাইশ বছর তাঁকে লিখতে হয় 'ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি', লিখতে হয় :

তোমার পরশ নাহি আর
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছে অন্তরে আমার,
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।

(কৃতজ্ঞ : পূরবী)

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্মরণের কয়েকখানি কবিতাতেই পত্নীর প্রতি নিবেদন সেরেছেন—এই বিভ্রান্তি থেকে বাঙালী পাঠককে উদ্ধার করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবিমানসী' ১ ও ২তে মৃণালিনী প্রসঙ্গে আলোচনায়। যাইহোক, 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে খাপে খাপে রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা মেলানো যাবে না। সে উদ্দেশ্য আমাদের নয়ও। কিন্তু কমলা ও হেমনলিনী উভয়কেই অন্তরে স্থান দেওয়া রমেশের মধ্যে প্রতিফলিত হয় স্বয়ং কবিরই অন্তর রহস্য। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ রচনাসূত্রে যেমন তিনি ''শিশু''কে উপলক্ষ্য করে ছলনা পূর্বক শিশুর মার-সঙ্গ' পাওয়ার কথা জানান তেমনি 'নৌকাডুবি' লিখতে লিখতেও তিনি যেন কাছে পেতে

চেয়েছেন তাঁর দুই প্রিয় নারীকে। 'নৌকাডুবি' তাই শুধু তাঁর আত্মজীবনের মণিসমৃদ্ধ উপন্যাস নয়, তাঁর ইচ্ছাপূরণের উপন্যাসও বটে। রমেশের ট্র্যাজেডিকে তিনি যেমন বিচ্ছেদের মাধুরীতে বিধুর করেছেন তেমনি নিজের আরেকটি সত্তা দিয়ে তৈরি করেছেন নলিনাক্ষকে মিলিয়েছেন তাঁকে কমলারূপিনী মৃণালিনীর সঙ্গে। এ যেন পত্নীর প্রতি একধরনের poetic justiceও। মৃণালিনীর এমন একজন রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্য যে শুধু তাঁরই, তাই নলিনাক্ষর সঙ্গে হেমনলিনীর বিয়ের কথা উঠলেও হেমনলিনী সম্পর্কে তার কোনো আকর্ষণ দেখি না আমরা। অন্যদিকে বউঠানের আত্মহত্যাকে কোনোভাবে মানতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। ভানুসিংহ আত্মবিধ্বংসী রাধাকে তিরস্কার করলেও (ছিয়ে ছিয়ে রাধা) বৌঠানকে আত্মঘাতী হওয়ার পথ থেকে সরাতে পারে নি। নলিনাক্ষর বচনসুধা হেমনলিনীকে সংহত করে, সে তার দিনলিপিতে লেখে, 'আমি মৃত্যুজালে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আবার যে একদিন আমাকে নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহা আমি মনেও করিতে পারিতাম না। আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম।' 'মৃত্যুজাল' কথাটি এখানে নিছক কথার কথা হিসেবে এসেছে এমন নয়। এ যেন বৌঠানের resurrection যা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। 'মথুরা'র রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এতদূর যাওয়াই সম্ভব ছিল। এতো আর যেমন খুশির ব্রজধামে 'বালগোপালের লীলা'র সময় নয়।

শুধু কাদম্বরী আর মৃণালিনীই নয়, মা সারদা দেবীকেও লিখতে লিখতে পেতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক ভাই বোনের মধ্যে যে মাকে পেয়ে ওঠেননি মন ভরে তাঁকেই তিনি পেতে চেয়েছেন নলিনাক্ষর মার ভিতরে। আমরা যথাসময়ে সেই অনুষঙ্গে ঢুকবো।

২

হেমনলিনীর মধ্যে কাদম্বরীর ছায়াপাতকে অনুধাবন করতে প্রথমেই আমরা 'হেমনলিনী' নামের অক্ষরবিন্যাসকে খেয়ালে রাখবো। নামটির শুরুই 'হে' দিয়ে যা রবীন্দ্র-কাদম্বরীর সম্পর্কের অনুষঙ্গ বহন করছে। কবি 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ ''শ্রীমতী হে' কে উৎসর্গ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার বলেছেন—আমরা শুনিয়াছি 'হে' কাদম্বরী দেবীর কোনও ছদ্মনামের আদ্যক্ষর। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'—এক গ্রীক দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে তাঁহাকে ডাকিতেন (আবির্ভাব : কবিমানসী, পৃ. ৫১)। 'হে'র আরো একটি অনুষঙ্গ আমরা সজনীকান্ত দাসের সূত্রে জানতে পারি। 'হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত' কবিতাটি 'শ্রীমতী হে'কে উৎসর্গীকৃত। 'হে'র রহস্য প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখছেন :

'হে' কে কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী। সেই নামের আড়ালের সুযোগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, ইহাই সত্য : অন্য সব অনুমান মিথ্যা (কচ ও দেবযানী : কবিমানসী পৃ. ১৪২)। যাইহোক, হেকেটি ধরা যাক আর হেমাঙ্গিনীই ধরা যাক, কাদম্বরীর সংযোগ স্পষ্ট।

এবার আসা যাক নামের ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে উপলক্ষে রচিত আশীর্বাদী কবিতায় বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নববধূর নাম দেন স্বর্ণমৃণালিনী। 'হেমনলিনী'র সঙ্গে নামের আপাত সাদৃশ্য মনে আসা স্বাভাবিক। এখানে কিন্তু 'নামের খেলা'য় দক্ষ রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম চাল ঢেলেছেন। কাদম্বরীর প্রিয় কবি বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন :

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী।

'সারদামঙ্গল' কাদম্বরীর অতিপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ ছিল। তাঁর নিষ্ঠুর প্রয়াণে ব্যথিত কবি 'পতিব্রতা' কবিতায় লিখলেন :

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনীগো!

'আসন দাত্রী'তে বিহারীলাল তাঁকে সরস্বতী স্বরূপিণী করে ফেলেছেন—এদেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচেনা। 'সুবর্ণ-নলিনী' আর 'প্রফুল্ল নলিনী' একাকার হয়ে 'হেমনলিনী' নামের সূত্র রচনা করেছে এমনটি ভাবা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। এছাড়া 'অঙ্গ'র বদলে 'নলিন' বসানোর মধ্যে একধরনের Platonic subtitution রয়ে গেছে যা দেহান্তরিতা কাদম্বরীকে অপূর্ব সুষমায় উপস্থাপিত করেছে। কবি ও প্রাবন্ধিক সঞ্চিতা চক্রবর্তী আমাকে এই ভাবনাটিতে আলোকিত করেছেন।

বর্ষার আবহ কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ককে এক বিশেষ মাধুরী দিয়েছে-এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়। চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির কথা লিখতে গিয়ে ''জীবনস্মৃতি'র 'গঙ্গাতীরে অংশে লিখছেন—কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম। বলাই বাহুল্য চন্দননগর বসবাসকালে তাঁরা দুজনে খুবই কাছাকাছি ছিলেন। প্রিয় নারীর সান্নিধ্যই তাঁকে বাদল প্রকৃতির মত্ততায় উৎসারিত করেছিলো। ব্যাপারটি শুধু 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করে ক্ষান্ত হন নি তিনি। অতিপ্রিয় অনুষঙ্গ বলেই তা ছেলেবেলাতেও এসে গেছে :

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম নিজে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজে করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিন আজও বয়ে গেছে আমার বর্ষাদিনের সিন্দুকটাতে। মনে পড়ে থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেঁধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙি নৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ্ শব্দে পড়ছে খাটের উপর। বউঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেননি, চুপ করে শুনলেন।"

এই হিরন্ময় নীরবতা 'সুর দিয়ে মিনে করা বাদল দিন', 'বর্ষা গানের সিন্দুক' সমস্ত কিছু বউঠাকরুনে একাকার একথা উপলব্ধি করতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

এই বর্ষাদিনের কথাই আবার আমরা একটু ভিন্ন উপস্থাপনায় পাবো 'লিপিকা'র 'একটি দিন' শীর্ষক রচনায় :

ঘরে-অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারপরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তারপরে সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

'ছেলেবেলা'য় 'বউঠাকরুন ফিরে এলেন' রয়েছে। এখানে নাটকটি আরেকটু বিস্তৃত—পাশের ঘর থেকে তার দুয়ার অবধি আসা, আবার ফিরে যাওয়া, আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়ানো, আবার ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসা। Fictionর আড়ালে সত্য ও সুন্দর কথা বলতে বোধ হয় সুবিধে হয়েছিল কবির। 'ছেলেবেলা'য় 'বর্ষাগানের সিন্দুক' এখানে 'দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল' যার খবর দুটি লোক জানে। এই বাদলদিনের স্মৃতিতে, সম্পদে একাকার রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন।

কলকাতায় ফিরে আসার পর রমেশ ও হেমনলিনীর সম্পর্ক যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছয় তাতে গভীর ভাবে ছায়াপাত করেছে বাদলদিন ও তার আবহ :

নূতন ভালোবাসায় মানুষকে অরণ্য পর্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। অবিশ্রাম বর্ষায় অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তস্ফূর্তির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল।

'লিপিকা'র উদ্ধৃত অংশে প্রিয় নারীর সেলাইয়ের কথা ছিল। কাদম্বরী যে সূচিশিল্পে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন তার প্রকৃষ্ট নমুনা বিহারীলালকে আসন বুনে দেওয়া যে আসনে শিল্পে ফুটিয়েছিলেন কয়েকটি লাইন :

হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলুঢুলু দু'নয়ানে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও।

কাদম্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি বিহারীলাল রচনা করেন 'সাধের আসন'। 'নষ্টনীড়' গল্পে অমল-চারু সম্পর্কে যে অমল মাধুরী ঝরেছে তার একটি বিশিষ্ট চিহ্ন অমলের জন্য চারুর চটি বুনে দেওয়া যাতে বৌঠানের ছায়াপাতের উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় 'নৌকাডুবি'তে বর্ষার অন্তরঙ্গতার ঠিক আগে এসেছে হেমনলিনীর সেলাইব্যস্ততা যার মধুর পরিণতি একটি কোণে 'র' লেখা রেশমের ফুলকাটা মখমলে বাঁধানো একটি 'ব্লটিং-বহি'। 'র' রবীন্দ্রনাথেরও আদ্যক্ষর। এমন উপহার তিনি প্রিয় নারীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা তা জানা নেই। না পেলেও 'নৌকাডুবি' লিখতে লিখতে নিজের ইচ্ছে পূরণের সুতো বুনতেই পারেন তিনি।

'ছেলেবেলা'য় একটি বিষয়ে বড় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ-শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। এর ফলে বৌঠানের হাতের সেবা জুটতো না কপালে, উল্টে অন্যদের সেবা করতে গিয়ে বৌঠানের সময়ের ভাগ যেত কমে। 'নৌকাডুবি'র রমেশকে নিজের নীরোগ শরীর দিলেও হেমনলিনীর 'সেবা'র ব্যবস্থা করে বোধহয় আরেকটা ইচ্ছাপূরণ ঘটালেন তিনি :

সর্দির জন্য উৎকণ্ঠা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না; অল্পেই যে তাহার সর্দি হয়, এমন কোনো লক্ষণও তাহার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে নাই, কিন্তু বর্ষণের দিনে হেমনলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাঁহাকে কাটাইতে হত—দুই পা মাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অন্যায় দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত।

একে বর্ষার দিন, তায় বৌঠানের শুশ্রূষা—দুই মিলে রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি সুখস্বপ্ন আঁকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

জীবনস্মৃতির 'গঙ্গাতীরে' থেকে উদ্ধৃতাংশে আমরা দেখেছিলাম হারমোনিয়াম নিয়ে ইচ্ছেমতো বাদল গান গেয়ে "খ্যাপার মতো" মধ্যাহ্ন কাটাতেন কবি। 'লিপিকা'র 'একটি দিন' শীর্ষক রচনাতেও দেখলাম যন্ত্র হাতে নিয়ে সংগীতচর্চার উল্লেখ। হারমোনিয়াম নিয়ে এই মত্ততাই যেন লঘু অতিশয়োক্তিতে রমেশের হারমোনিয়াম নিয়ে পাগলামিকে ছুঁয়ে গেছে। নিজেকে নিয়ে তামাশা করা যে তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস তা 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাঠক মাত্রেই অনুভব করেছেন। উপন্যাসে আত্মজৈবনিক প্রক্ষেপে তা আরেকটু বাড়াবাড়ির পর্যায় গেছে। হয়তো তা নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা থেকেও হতে পারে :

সেদিন রমেশের শরীর মন যেন হাওয়ার উপরে ভাসিতে লাগিল। অশান্ত হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা রাস্তায় ছাড়া দিবার জন্য সে আপনার বসার ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া হারমোনিয়ামটা লইয়া পড়িল। আজ আর তাহার যত্নণত্বজ্ঞান রহিল না—যন্ত্রটার উপরে তাহার উন্মত্ত আঙুলগুলো তাল-বেতালের নৃত্য বাঁধাইয়া দিল।

রমেশের সংগীতবিদ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীত পারদর্শিতা কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু গঙ্গাতীরের রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলার উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথ, 'লিপিকা'র একটি দিনের লুকনো রবীন্দ্রনাথ ও কি হাওয়ার উপরে ভাসছিলেন না? অশান্ত হৃদয়ের আবেগকে কোনো এক রাস্তায় ছাড়তে চাইছিলেন না? যন্ত্রটার উপর উন্মত্ত নৃত্য সঞ্চালন করাচ্ছিলেন না? সবকিছুই কেমন এক সুতোয় বাঁধা হয়ে যাচ্ছে না কি?

রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে কবির অন্তরের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর কাব্যসাধনায় কাদম্বরীই তাঁর গুর্বী। কাদম্বরীকে উত্তমর্নতা দিয়ে নিজেকে সামান্যতায় নিয়ে আসা

তাঁর কাব্য ও জীবনসাধনার অনপনেয় অংশ হয়ে ওঠে। এখানেও এলোমেলো হারমোনিয়াম বাদক রমেশের শিক্ষিকা হিসেবে দেখা দিলো হেমনলিনী। এই হারমোনিয়াম চর্চা অবশ্য শুধু কৌতুকাবহ ছিলো না। তার Sublimisationও দেখা গেলো :

রমেশ সে গৎটা হেমনলিনীর কাছ থেকে হারমোনিয়মে শিখিয়াছিল, বাসায় গিয়া সেইটে খুব করিয়া বাজাইতে লাগিল। কিন্তু একটিমাত্র গৎ সমস্ত দিন বাজানো চলে না। কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিল মনে হইল, তাহার ভালোবাসার সুর যে সুদূর উচ্চে উঠিতেছে, কোনো কবিতা সে পর্যন্ত নাগাল পাইতেছে না।

এই 'ভালোবাসার সুর সুদূর উচ্চে' ওঠার ছবি আমাদের চকিতে একটি গানের কথা মনে করিয়ে দেয় :

> আমি উতল প্রাণে আকাশ পানে হৃদয়খানি তুলি
> বীণায় বেঁধেছি গানগুলি
> তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে।

রমেশ হেমনলিনীর কাছ থেকে শেখা গৎ হারমোনিয়ামে বাজায় আর রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে গান ধরেন! এইটুকু তফাৎ!

পত্রিকাপাঠে সাংগীতিক সংকেত আরো উন্মোচিত হয়ে গেছিলো। রবীন্দ্রসংগীতের রসিক শ্রোতা মাত্রেই ভৈরবী 'রাগিনীর' প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আসক্তি বা ভালোবাসা সম্পর্কে অবহিত। এবারে নীচে উদ্ধৃত অংশটি পড়ে দেখুন :

ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর বাড়ীতে একটি পরিচিত ভৈরবী সুর হার্ম্মোনিয়ামে বাজিতে আরম্ভ করিল। হেমনলিনী জানে যে, এই ভৈরবী রমেশের প্রিয় রাগিণী। এই রাগিণীর পাখা মেলিয়া দিয়া বিরহিনীর আপনার হৃদয়টিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া কোথায় কাহার কাছে কি সংবাদ লইতে একলা পাঠাইয়া দিল?

উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এই অংশটি 'একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার' কথাগুলির পর ছিল (পৃ. ৪২, বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'নৌকাডুবি')। সম্ভবতঃ নিজেকে বেশি মুক্ত করে ফেলার অনুভবে রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি বই থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। এই সরিয়ে ফেলা কিন্তু রমেশের সঙ্গে তাঁর identificationকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে।

পত্রিকা পাঠ থেকে এরকম আরেকটি সাংঘাতিক উদাহরণে যাবো আমরা। এটি ষোড়শ পরিচ্ছেদের। 'বিচিত্র আকারের রেখা ফেলিয়াছে' কথার পর ছিল (পৃ. ৫০ 'নৌকাডুবি', বিশ্বভারতী) :

> আজ অপরাহ্নে রমেশ ও হেমনলিনী যে জানলার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সেই জানলাটি তখন ছায়ার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া ছিল। সেই জানলার দিকে চাহিয়া রমেশ হাঁটু গাড়িয়া জোড় হাত করিয়া বসিয়া সেই জ্যোৎস্নাভিষিক্ত নিস্তব্ধ আকাশের নীচে নিজের ললাট ভূতলে লুণ্ঠিত করিল। তাহার প্রেম একটি বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারিত হইয়া গেল।

এই প্রেমের বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারণ স্বাভাবিকভাবে আমাদের 'কবিমানসী'র জীবনদেবতার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। জগদীশ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন 'সুরদাসের প্রার্থনা কবিতায় সুরদাস যেমন তাঁর প্রিয় নারীর মধ্যে তাঁর দেবতাকে দেখতে চাইলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভালোবাসার মানুষ, প্রেরণাদাত্রীর মধ্যে পেলেন তাঁর জীবনদেবতাকে। রমেশের হেমনলিনীর প্রতি ভালোবাসার ভক্তিতে সম্প্রসারণ যেন সেই অনুষঙ্গেরই ছায়াপাত ঘটালো। রমেশ তখন আবার কমলার সঙ্গে জড়িয়েছে দাম্পত্যবন্ধনে। মিথ্যে হলেও সে যেন মিথ্যে না এবং তা কমলারই মাধুর্যে। জাহাজে তারা ভেসে চলেছে পশ্চিমের দিকে। সেই যাত্রাপথেই এক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ রাতের প্রেক্ষাপটে রমেশের দিকে একটু তাকানো যাক :

> পশ্চিম-আকাশ হইতে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া গেল, চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে কঠিন জগৎ যেন বিগলিত হইয়া আসিল। রমেশ আপনা আপনি মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "হেম, হেম'! সেই নামের শব্দটি মাত্র যেন সুমধুর স্পর্শরূপে তাহার সমস্ত হৃদয়কে বারংবার বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল; সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন অপরিমেয়-করুণারসার্দ্র দুইটি ছায়াময় চক্ষুরূপে তাহার মুখের উপরে বেদনা বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তোমারি নাম বলব নানা ছলে—এতো কবিরই অভিপ্রায়। রাণী চন্দের 'গুরুদেব' বইতে আমরা পাই কাদম্বরীর মৃত্যুর পর তাঁর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছাদে পায়চারি করেছেন কবি:

নতুন বউঠান মারা গেলেন, কী বেদনা বাজল বুকে। মনে আছে সে সময়ে আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেছি, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছি, 'কোথায় তুমি নতুন বউঠান, একবার এসে আমায় দেখা দাও'।"

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনের সূচনার চারমাস পরেই কাদম্বরীর মর্মান্তিক মৃত্যু। কমলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েও যেমন রমেশ আপন মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরে চলে যাওয়া হেমনলিনীকে ডাকে তেমনি সদ্যবিবাহিত রবীন্দ্রনাথ চিরবিদায় নেওয়া বউঠানকে ডেকে যান ব্যথাতুর রাতে। তাঁর বুকে বাজা বেদনা যেন রমেশের মুখের উপর বেদনা বিকীর্ণতায় কোথাও মিলে যায়।

পত্রিকায় রমেশ বিয়ে করতে যাবার আগে হেমনলিনীর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখেছিল, সে চিঠি পোস্ট না করা চিঠি। এই চিঠিতে রমেশ তার বিয়ের জন্য ক্ষমা চেয়েছে হেমনলিনীর কাছে, বিয়ের জন্য যে বেদনা সে দিল হেমনলিনীকে তার প্রায়শ্চিত্ত সে সারাজীবন করতে চেয়েছে। সেইসঙ্গে এ কথাও জানিয়েছে হেমনলিনীর জায়গা তার জীবনে কেউই নিতে পারবে না :

"দেবি, অপরাধ করিতে চলিলাম। ক্ষমা প্রার্থনা করিবার এবং ক্ষমা আশা করিবার অধিকার আমার নেই। যে দুঃখভার আজ হইতে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছি দণ্ডদাতা বিধাতা তাহা অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ আমাকে দিতে পারেন না। তোমাকে যদি বেদনা দিয়া থাকি, চিরজীবনের বেদনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। একথা শুনিয়া তোমার কোন সুখ আছে

কিনা জানি না—কিন্তু বলিয়া আমার তৃপ্তি হয় যে, হৃদয়ের যে অংশ তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছি, সেখানে কোনদিন আর কেহ পদার্পণ করিবে না।

বিয়ের আগে রবীন্দ্রনাথের নীরব মনে এই কথাগুলি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ সম্পর্কে পরবর্তী সচেতনতাই বোধ হয় তাঁকে পুস্তক প্রকাশের সময় এই অংশটি পরিহার করিয়েছে। লক্ষণীয়, এই 'দেবি' সম্ভাষণ কাদম্বরীর অনুষঙ্গে লেখা রবীন্দ্র কবিতায় পেয়েছি আমরা। "দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পুরাতে হইবে আশ" সুরদাসের প্রার্থনা কবিতার দ্বিতীয় লাইন। আগেই উল্লেখ করেছি জগদীশ ভট্টাচার্য এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরীর প্রতি ভালোবাসার apotheosis হিসেবে দেখিয়েছেন। 'কল্পনা'র 'প্রণয় প্রশ্ন' কবিতাতেও এসেছে দেবীর কণ্ঠে ভক্তকে সম্বোধন :

এ কি তবে সবি সত্য
হে আমার চির ভক্ত
আমার চোখের বিজলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য
আমার মধুর অধর বধূর নবলাজ-সম-রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য?

শুধু 'প্রণয়প্রশ্ন' নামে নয়, 'আমার মধুর অধর বধূর নবলাজ-সম-রক্ত' লাইনটির অন্তর্নিহিত passion স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছে দেবী ও ভক্তের সম্পর্কে ভক্তি ও ভালোবাসা মিলেমিশে গেছে। একটু আগে আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ভক্তি ও ভালোবাসার সমন্বয়ের কথা বলছিলাম তা কাদম্বরীর অভিঘাতেই যে সম্ভব হয়েছে তার আরো একটি বিচ্ছুরণ আমরা পেলাম।

রবীন্দ্রকাহিনীতে একাধিকবার বিয়ে করতে যাওয়া কাহিনীর নায়িকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার মতন উপস্থিত হয়েছে। 'কঙ্কাল' গল্পটির কথাই ধরা যাক। 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ' গ্রন্থে এই গল্পটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তপোব্রত ঘোষ লিখছেন, "দীপনির্বাণের অনুষঙ্গে রুদ্ধশ্বসিত সেই রাত্রে রবীন্দ্রনাথের মনে কিন্তু প্রথমেই কঙ্কালের স্মৃতি জেগে ওঠেনি, জেগে উঠেছিল অন্য কোনো মৃত্যুর স্মৃতি, আর এখানেই গল্পের শিল্পরহস্যের চাবিকাঠিটি লুকিয়ে আছে।" বলাই বাহুল্য, এই মৃত্যুটি কাদম্বরীর আত্মঘাতের প্রতিই ইঙ্গিত করছে। রমেশ হেমনলিনীকে চিঠিতে লিখেছেন—

তোমাকে যদি বেদনা দিয়া থাকি, চিরজীবনের বেদনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

অর্থাৎ জীবনযন্ত্রণার একটা সাম্য যেন দুজনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার প্রসঙ্গ এসে গেছে। 'কঙ্কাল' গল্পে দুজনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মৃত্যুর সাম্য। মেয়েটি আত্মঘাতী হয়েছে এবং প্রেমিককেও বিষ দিয়ে গেছে। বউঠানের আত্মঘাত কোথাও যেন রবীন্দ্রনাথেরও মৃত্যু—এমনই একটা শিল্পিত ব্যঞ্জনা যেন এখান থেকে উঠে আসতে দেখি আমরা। 'কঙ্কাল' গল্পের ডাক্তার

নাকি অর্থলোভে বিয়ে করতে ইচ্ছুক! রবীন্দ্রনাথ টাকার লোভে বিয়ে না করলেও এক ধনীকন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল যা নিয়ে শান্তিনিকেতনের অর্থসংকট প্রসঙ্গে তিনি পরে বিস্তর হাসিঠাট্টা করেছেন! গল্পে ডাক্তার নায়িকাকে কনকচাঁপা বলেছিলেন। বৌঠানের অনুষঙ্গে সবকিছুই সোনা! 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র নায়িকা ভাসায় 'সোনারতরী', রাত্রি যখন দিনের পারাবারে এসে মেশে, দেখা হয় 'তোমায় আমায়' তখন নিকষেতে ফুটে ওঠে 'সোনার রেখাখানি', কাদম্বরীর আদলে নায়িকার নাম হয় হেমনলিনী, কণকচাঁপা! 'নষ্টনীড়' গল্পেও অমলের বিয়ে ও দূরে চলে যাওয়া গভীর আঘাত দেয় চারুকে। লক্ষণীয় 'কঙ্কাল' ও 'নষ্টনীড়' গল্পের নায়িকারা বিবাহিতা। একজন বিধবা, অন্যজন সধবা। হেমনলিনী অনূঢ়া হলেও আত্মজৈবনিক বাস্তবতার ঘেরাটোপ রমেশ ও হেমনলিনীর বিবাহ সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে!

রবীন্দ্রনাথকে কাদম্বরীর আত্মহত্যার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। ব্যাপারটা সেই পর্যায়ে গেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে তিনি 'নিশীথে' বা 'মানভঞ্জন' লিখতে পারতেন না, লিখতে পারতেন না কাদম্বরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 'তোরা বসে গাঁথিস মালা তারা গলায় পরে'র মতো প্রতিবাদী কবিতা। কিন্তু কনরাডের গল্পে যে fine conscience র ছাপ আমরা পাই সূক্ষ্মমতি রবীন্দ্রনাথেও তা অলীক বা অমূলক নয়। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের পর কাদম্বরীর জীবনের বাস্তবতা ও রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাস্তবতার দ্বান্দ্বিকতাই যেন 'তোমার হল শুরু' গানটিতে কাদম্বরীর বাচনিকে ব্যক্ত হয়েছে। গানটি ১৯১৬ সালে রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথকে নিছক তাৎক্ষণিকতার কবি ভাবা ভুল। সারাজীবন ধরেই তাঁর লেখায় দেখা দিয়েছেন কাদম্বরী :

তোমার জ্বলে বাতি তোমার ঘরে সাথি—
আমার তরে বাতি, আমার তরে তারা।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে যখন নববধূরূপী সাথি তখন কাদম্বরী একা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্যত্র আমোদে ব্যস্ত। সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথকে এই তফাৎ অবশ্যই স্পর্শ করেছিল। বিয়ের সিদ্ধান্তের অন্তর্লীন অনুতাপই তিনি ঢেলে দিয়েছেন পত্রিকায় প্রকাশিত রমেশের চিঠিতে। তবু বৌঠানের আত্মঘাত মানতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ। ভানুসিংহ রাধার বিরহযন্ত্রণাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেও তার আত্মঘাতী প্রবণতাকে সে তিরস্কার করেছে :

ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁ হু দেখ বিচারি।

তাই রমেশরূপী রবীন্দ্রনাথ হেমনলিনী তথা কাদম্বরীকে যে দুঃখ দিয়েছেন তাকে অপনয়নের জন্য দেখা দেন নলিনাক্ষরূপী রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ যিনি শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত করছেন। নলিনাক্ষের 'ক্ষতি' শীর্ষক বক্তৃতা হেমনলিনীর প্রাণ জুড়িয়ে দিল :

সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না। ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই তখনই যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা-কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে সে লোক দুর্ভাগা; বরঞ্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে।

বক্তৃতাংশটি থেকে যে ভাবনাটি স্পষ্টতঃই আলোকিত হয়ে উঠলো তা ত্যাগের ভাবনা। শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা খুললে আমরা পরপর 'ত্যাগ' ও 'ত্যাগের ফল' শীর্ষক দুটি বক্তৃতা পাই। ঠিক তার পরের বক্তৃতাটির নাম প্রেম এবং সেখানেও এসে গেছে 'ত্যাগের অনুষঙ্গ' :

যদি বল, ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে তাতে মন সায় দেয় না, যদি বল ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে, তা হলে মন আর কথাটি কইতে পারে না—এই কথাটাকে যদি সে ঠিকমত অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে, "তা হলে যে বাঁচি"।

নলিনাক্ষের 'মুখে ও কণ্ঠস্বরে যে একটি অবিচলিত শান্তির ভাব' তা হেমনলিনীকে 'আশ্রয় দেয়'। কিন্তু এই শান্তিকল্যাণের বেশি আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। কারণ, আত্মজৈবনিক বাস্তবতা ও কাহিনীর ন্যায়প্রতিষ্ঠায় নলিনাক্ষ কমলা তথা মৃণালিনীরই প্রাপ্য।

এই ত্যাগের মধ্যে পাওয়ার যে কথা নলিনাক্ষর মুখে শুনলাম তা রবীন্দ্রনাথের গানেও প্রকাশিত হয়েছে। যে ভাবনায় নিজেকে সম্বৃত রাখার চেষ্টা করছেন সেই ভাবনাই তিনি শোনালেন হেমনলিনীরূপী বৌঠানকে :

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি—পেয়েছি আঁধার রাতে॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।

রমেশের চোখে দেখা হেমনলিনীর একটি ছবির উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করছি। কাদম্বরীর ছবির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের এই বর্ণনাংশটি অবধারিত তাঁর কথা মনে করাবে:

ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্নরচিত ভঙ্গি ঐ গ্রীবার উপর কোমলবিরল কেশগুলি, তাহারই নীচে সোনার হারের একটুখানি আভায়, বাম স্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিম প্রান্ত, সমস্তই রেখায় রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'শ্যামা' কবিতার সূচনাতেই দেখা যায় গলায় হারের উল্লেখ—উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি। জগদীশ ভট্টাচার্য কিশোর বেলায় কাদম্বরীর অনুষঙ্গে ভাবনার প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এই কবিতাটিকে। 'লিপিকা'র 'বাঁশি' রচনাটির দিকে তপোব্রত ঘোষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে সোনার হারের স্পষ্ট উল্লেখ :

"যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির

দিকে চেয়ে দেখলেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দ পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।"

এই ছবিটির কাদম্বরী নির্ভরতা সম্পর্কে আমাদের সন্দিহান হওয়ার কথা নয়। 'ছেলেবেলা'য় বৌঠানের আবির্ভাবের ছবিই নববধূর আবির্ভাবের এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে, বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। বৌঠানের এই নববধূবেশ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা archytype হয়ে রয়েছে যার প্রকাশ 'বাঁশি' রচনায়।

আরেকটি কৌতুকাবহ অনুষঙ্গর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে থাকতে পারছি না। নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালায় একজন অতি স্পর্শকাতর, ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথও ছিলেন যার সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "যে আমি ওই ভেসে চলে গানটিতে" আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন—একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে; একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে/ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে। এই রবীন্দ্রনাথ বৌঠানের সঙ্গ তিনি ছাড়া যাঁরা পেতেন তাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঈর্ষাকাতর। লক্ষণীয়, হেমনলিনীর বাবা ছাড়া যে দুজন হেমনলিনীর কাছাকাছি এসেছেন সেই অক্ষয় এবং হেমনলিনীর দাদা যোগেন্দ্র উভয়েই নামগত দিক দিয়ে কাদম্বরীর ঘনিষ্ঠবৃত্তের মানুষ। কাদম্বরীর বুনে দেওয়া আসনে বিহারীলালকে 'যোগেন্দ্র' বলে সম্বোধন করেছেন, অক্ষয় চৌধুরীরও ঠাকুরবাড়ীর নন্দনকাননে ছিল যাতায়াত! স্বভাবে নৌকাডুবির অক্ষয় ও যোগেন্দ্রর সঙ্গে অবশ্য এঁদের কোনো মিল নেই এবং সচেতন, পরিশীলিত রবীন্দ্রনাথ এদের দুজনকেই অকপট সম্মান জানিয়েছেন। কিন্তু ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথ বোধহয় 'নৌকাডুবি' লেখার অছিলায় কিছু দুষ্টুমি সেরে নিলেন!

৩

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছো মধুর,
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল দলে
মানস সরসী আজি তব পদতলে

'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাটিতে কবি তাঁর লোকান্তরিতা পত্নীকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করেছেন। ঠাকুরবাড়ীর মানুষজন ও অতিথিরা তাঁকে লক্ষ্মীরূপেই দেখেছেন। ভাবেভোলা কবির সংসার যে নৈপাট্যে, যে মমতায়, যে স্নিগ্ধশ্রীতে লালন করেছেন তিনি তা কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। শান্তিনিকেতনে যে সংসারের পত্তনে কবির অংশীদার ছিলেন তিনি সেখানেও তাঁর শূন্যস্থান কবি সবসময়ই অনুভব করেছেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সবকিছুই দিতে পারলেও মাতৃস্নেহ দানে তিনি অপারগ একথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি তিনি কারণ 'রথীর মা' তাঁকে এ ব্যাপারে অসহায় করে গেছেন।

পত্নীর এই লক্ষ্মীময়ী ব্যক্তিত্বর কথা মাথায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদলে তৈরি চরিত্রর নাম রাখেন কমলা। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কমলা সত্যিই সার্থকনামা যার স্নিগ্ধতা সবসময়ই

পরিবেশকে সিক্ত ও তৃপ্ত করেছে। কমলার নামের সঙ্গে মিলিয়ে রমেশের নাম, রমেশ অর্থ রমা তথা লক্ষ্মীর পতি। তাদের দুজনের দেখা হওয়া যে নিছক দৈবদুর্বিপাক নয়, এর মনে যে একটি ছন্দ রয়েছে সেটাই যেন ইঙ্গিত করেছেন লেখক। কাদম্বরীর গভীর প্রভাবে বেড়ে ওঠা রবির মনে যেমন জায়গা করেছিলেন মৃণালিনী তেমনি রমেশের অন্তরে হেমনলিনীর সঙ্গে কমলা ও স্থান করে নেয়। অন্যদিকে নলিনাক্ষ অর্থাৎ কমলার স্বামীর নাম কিন্তু তৈরি হয়েছে মৃণালিনীর আভাসেই।

মৃত্যু মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক

স্মরণের এই কবিতাটিতে 'আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক'র প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানেই শুধু নয়, এই ভাবনারই আরো নিবিড় পুনরাবৃত্তি আমরা পাবো স্মরণের আরো একটি কবিতায় :

তোমার সে ভালোলাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা-একা
দেখি দু'জনের দেখা
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।

'মৃণালিনী' যদি রবীন্দ্রনাথের নয়নে তাঁর দৃষ্টি রেখে গিয়ে থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথ যদি দুজনের দেখা দেখতে থাকেন তবে তিনি 'নলিনাক্ষ'ই হয়েছেন। বস্তুত নলিনাক্ষর নান্দনিকতার স্পর্শসমৃদ্ধ শুদ্ধ জীবন আমাদের আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করায়, তার বক্তৃতাকেও ঢুকিয়ে দেওয়া যায় শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় যা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

নলিনাক্ষর চিকিৎসক পেশাটি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয়। চিকিৎসায় তাঁর উৎসাহর নানা দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি! শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সকৌতুকে বলতেন তিনি শুধু কবি নন, কবিরাজ ও! ব্যাপারটা যে নিছক হাসিঠাট্টার নয় তা রথীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথাতে পেয়ে যাবো :

"কলকাতায় এসে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালেন। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা প্রতাপ মজুমদার, ডি.এন. রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়ি আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমনকি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁর ব্যবস্থা দিতেন।"

প্রথিতযশা চিকিৎসকদের রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের সমকক্ষ ভাবার মধ্যে হয়তো কিছুটা সৌজন্যর বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু একথা সত্যি যে চিকিৎসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে যথেষ্ট চর্চা, আগ্রহ

এবং দখল ছিলো সে কথা স্পষ্ট। স্ত্রীর চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যর্থ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণের উপন্যাসে নলিনাক্ষ ডাক্তার হবার মধ্যে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই লেখাতেই ছোটোবেলায় অ্যানাটমি পোড়োর 'কংকাল' গল্পে ডাক্তার সাজার সম্ভাবনা আলোচনা করেছি। 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ' গ্রন্থে 'নিশীথে গল্পের ডাক্তার শ্রোতার মধ্যে তপোব্রত ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছেন। মৃণালিনীদেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে দুটি ছোটগল্প লেখেন তার মধ্যে একটি হল 'মাল্যদান'। জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্পটিতে মৃণালিনীর প্রভাবের কথা বলেছেন। লক্ষণীয়, এই গল্পের নায়কও কিন্তু ডাক্তার। আমাদের দুর্ভাগ্য, অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিতও রবীন্দ্র-মৃণালিনী সম্পর্কের মাধুর্য ও রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর তার অভিঘাতকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকেরই ধারনা স্মরণের গুটিকয় কবিতার মধ্যেই তাঁর পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি সীমিত। বেরসিকের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন জগদীশ ভট্টাচার্য :

আয়তনের দিক দিয়ে স্মরণের সাতাশটি কবিতার চেয়ে উৎসর্গের তেরোটি কবিতা অনেক বড়। স্মরণের সাতাশটি কবিতার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা সবসুদ্ধ ৪৮০, আর উৎসর্গের তেরোটি কবিতার পঙক্তিসংখ্যা ৬৯৩। পত্নী বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ এই ১১৭৩ পঙ্‌ক্তি কবিতা রচনা করেছেন শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শেষ খেয়া', 'গোধূলি' লগ্ন', 'প্রভাতে'—এই তিনটি কবিতা। তাদের মোট পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ১২৩। তাহলে সবসুদ্ধ দাঁড়াল স্মরণের ৪৮০, উৎসর্গের ৬৯৩, এবং খেয়ার ১২৩, অর্থাৎ ১২৯৬ পঙ্‌ক্তি।

(মৃণালিনী : মঙ্গল-মূরতি : কবিমানসী ২, পৃ. ৯২)

জগদীশবাবু এই সঙ্গে সঙ্গতকারণেই যুক্ত করতে চেয়েছেন 'শিশু'র কয়েকটি কবিতা কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই কবুল করেছেন 'শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম'। 'নৌকাডুবি'ও প্রিয়পত্নীকে কাছে পাবার মধুর ছলের খেলা যেখানে রমেশরূপী রবীন্দ্রনাথ কমলাকে হারালেও নলিনাক্ষরূপী রবীন্দ্রনাথ পুনরুজ্জীবিতা কমলা তথা মৃণালিনীকে পেয়ে যাবেন।

বিয়ের পরে এক নাবালিকা গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে কেমনভাবে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? কেমন করে অতিক্রম করেছিলেন মাঝখানের সংস্কৃতিগত ব্যবধানকে? তাঁর সংকট যে খানিকটা রমেশের মতোই ছিল একথা আন্দাজ করাটা বোধহয় খুব অলীক হবে না:

"ইহার সহিত কেমন কবিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি.এ. পাস করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসংগত বলিয়াই জানিত, তবু কোনো বই-বড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও আশ্চর্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোটো মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনের ক্ষেত্রেও যে এটি গভীরভাবে সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রাম্য বালিকার অমলিন সারল্যপূর্ণ সংস্রব তাঁকে কাদম্বরীর মৃত্যুশোক ভুলিয়ে না দিতে পারলেও কোথাও একটা দাঁড়ানোর জায়গা দিয়েছিল। কবিমানসী-২তে জগদীশ ভট্টাচার্য মৃণালিনীকে

'মঙ্গল-মূরতি' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সহজ প্রীতিমূলক সম্পর্কই ধীরে ধীরে তাঁর কল্যাণীরূপকে উদ্‌ভাসিত করে। রমেশের মতো রবীন্দ্রনাথও যে নবাগতা, নাবালিকা বধূর সঙ্গী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন তা এই গানটি থেকে স্পষ্ট :

দেখা হলে যখন তখন বিনা অপরাধে
মুখভঙ্গী করত আমায় অপমানের ছাঁদে।
শাসন করতে যেমন ছুটি হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি
কাজল আঁখি চোখের জলে ছলছলিনী
আমার সঙ্গে পঞ্চাশবার জন্মশোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁটলি' বলে সাড়া দিত মর্‌জি হলে
ঝগড়া-দিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী।

বিয়ের পর স্বল্পশিক্ষিতা মৃণালিনীকে শিক্ষিতা করে গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয় লোরেটো স্কুলে। সত্যিকারের পরিচয় জানার পর তাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে রমেশ তাকে বোর্ডিং স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। পশ্চাৎপটের প্রকৃতি এবং হোস্টেলের অতিরিক্ততাকে বাদ দিলে বিয়ের পরে স্কুলে ভর্তি হওয়ার ঘটনাটি কিন্তু পাশাপাশি থেকেই যায়। কবিজায়ার প্রতিক্রিয়া হয়তো কমলার মতোই ছিল :

> রমেশ কহিল, "তাহা হইলে তোমাকে ইস্কুলে যাইতে হইবে।" কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "ইস্কুলে! এতবড়ো মেয়ে হইয়া আমি ইস্কুলে যাইব।

কিন্তু কমলাকে স্কুলে যেতে হয়, যেতে হয়েছিল মৃণালিনীকেও। হোস্টেলে না থাকলেও। বালিকার সেই 'স্তম্ভিত অসহায় ভীত মুখশ্রী' কি স্কুল পালানো ছেলের মনে ছাপ ফেলে নি? স্কুল থেকে ছুটি পাবার আনন্দর বহিঃপ্রকাশকেই হয়তো কবি তার নামে ধরে রাখতে চেয়ে নাম দিয়েছিলেন 'ছুটি'!

রবীন্দ্র-মৃণালিনীর দাম্পত্য জীবনের সবচেযে মধুর অধ্যায় সম্ভবত কেটেছে গাজিপুরে। ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় পরিজনদের ঘেরাটোপের বাইরে একেবারে একান্তে এলেন দম্পতি, সঙ্গে শুধু শিশুকন্যা বেলা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে একটু ব্যাপারটা শোনা যাক :

সপরিবারে গাজিপুরে বাস সাংসারিক কবি জীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব। আপনার সংসারে স্বামীকে আপনার মতো করিয়া পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীমাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। বৃহৎ ঠাকুর পরিবারের মধ্যে বাসে কবিপত্নীর যে অভিলাষ এ পর্যন্ত অপূর্ণই ছিল। গাজিপুর-বাসে পৃথক সংসারিক জীবনের সূত্রপাত তাই প্রথম কার্যে পরিণত হইল; পক্ষান্তরে যৌবনের পরিপূর্ণতা কবিও এখন প্রথম পেলেন পত্নীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে-প্রণয়িনীরূপে। আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে, গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।

জগদীশ ভট্টাচার্য কবিমানসী-১ এ 'স্বর্ণমৃণালিনী' পর্বে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্যে এই গাজিপুর বাসের ফলপ্রসূতার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানেই লেখেন 'মানসী'র তৃতীয়

পর্বের কবিতাগুলি। লেখেন 'অপেক্ষা'র মতো অত্যন্ত possionate কবিতা যা তাঁর তৎকালীন যাপন তথা বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা থেকে উঠে আসা ধন। গল্পের পাকে রমেশ ও কমলার passion দেখানো সম্ভব হয় নি, কিন্তু গাজিপুর বাসের মাধুর্যের মধ্যে রমেশ ও কমলাকে নিয়ে গিয়ে কবি লুকিয়ে চুরিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে কাটানোর সেই দিনগুলির গন্ধ আবার নিতে চেয়েছেন। Passion না দেখাতে পারলেও কমলার গৃহিণীমূর্তির মধ্যে তিনি মৃণালিনীকে আঁকতে পেরেছেন :

"গৃহকর্মের মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য যেমন বিচিত্র, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে। রমেশ আজ কমলাকে সেই কর্মের মাঝখানে দেখিল; সে যেন পাখিকে খাঁচার বাহিরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল :

এতদিন কমলাকে রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই, আজ তাহাকে আপন নূতন সংসারের শিখর দেশে যখন দেখিল তখন তাহার সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা মহিমা দেখিতে পাইল।

ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় পরিজনের বাইরে শুধুমাত্র একার সংসারে মৃণালিনীর গাজিপুরের সংসার তাঁর 'স্বস্থান' বৈকি। মৃণালিনীর গৃহিণী-মহিমা রমেশের মতো রবীন্দ্রনাথও যে অপার আনন্দে উপভোগ করেছেন সে বিস্ময়ে কোনো সন্দেহ নেই। গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আফিম-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী গগনচন্দ্র রায় বাস করতেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে সপরিবারে স্বচ্ছন্দে রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কাহিনীতে ইনিই সম্ভবতঃ চক্রবর্তী হয়েছেন এবং এঁর পেশাটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর জামাই বিপিনকে।

মৃণালিনীর মাতৃস্বরূপা মূর্তি তাঁর ভৃত্যদেরও মায়ার বাঁধনে বেঁধেছিল। শিলাইদহ বাসকালীন মূলা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী তাঁর কাছে অনুনয় করে চাকরি নেয়। ভোজনরসিক এই চাকরটির বাড়তি খোরাকের ব্যবস্থা স্নেহশীলা মাইজীই করেছিলেন। শিলাইদহ থেকে বিদায় নেবার সময় হরিচরণের ভাষায় 'ঠাকুর চাকর ও আমলাদের বিষাদের সীমা ছিল না, বিশেষত মাইজীর বিদায়ে মূলা সিংর, কী কান্না'। এই মূলা সিং সম্ভবতঃ কিছুটা রদবদলের মধ্যে দিয়ে 'নৌকাডুবি'র উমেশ হয়েছে যার সঙ্গে কমলার প্রায় মা-ছেলেরই সম্পর্ক। পত্নীর এই সর্বময়ী মাতৃমূর্তি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতেন এবং তাঁর প্রতিফলন স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়েছে 'নৌকাডুবি'তে।

আগেই বলেছি, রমেশ রূপে তাঁকে হারিয়ে আবার তিনি তাঁকে পেতে চেয়েছেন নলিনাক্ষরূপে। নলিনাক্ষর শুদ্ধসত্ব জীবনের মধ্যে যেন তিনি নিজেকে মঙ্গলময়ী পত্নীর যোগ্য করতে চেয়েছেন। কমলার সঙ্গে নলিনাক্ষর মিলনমুহূর্তটি বড় সজল শুচিস্নিগ্ধতায় আঁকা :

"নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল, 'আমি জানি, তুমি আমার কমলা। এসো, আমার ঘরে এসো।

উপাসনা ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল, "এসো, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।" দুইজনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেতপাথরের মেজের উপর নত হইল, জানলা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুইজনের মাথার উপর আসিয়া পড়িল।"

কমলার নিত্যকর্মের অতিপ্রিয় অংশ ছিল নলিনাক্ষর উপাসনাগৃহ পরিষ্কার করা। এই আক্ষরিক তথ্যটি এবং উপরিউক্ত উদ্ধৃতি মাথায় রেখে আসুন মৃণালিনী প্রয়াণে রচিত এই কবিতাটির দিকে তাকাই :

আনো নীর
সকল কলঙ্ক আজি করো গো মার্জনা,
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এসো দ্বার খুলি ধীরে—
মঙ্গলকনকঘটে পূণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখো, পূজাশতদল
সহস্তে তুলিয়া আনো। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

নলিনাক্ষর এই নীরব মাল্যদান কবির পত্নীপ্রয়াণ অনুষঙ্গেই লেখা আরো একটি কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয় :

আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব
জ্বলে নাই দীপমালা; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগন।
আজিকার এই বার্তা জানে নি, শোনে নি কোনো জন
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি
আমার সংগীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।

মৃতা পত্নীর সঙ্গে কল্পবিবাহ, ভাব সম্মিলনের আবহ যেন কোথায় কমলা-নলিনাক্ষর শুচিস্নিগ্ধ মিলনের আবহের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অপরূপ সুষমায়। বস্তুতঃ স্মরণের কবিতায় মৃণালিনীর সতীরূপ বারবার করে দেখা দিয়েছে যা কমলার চরিত্রেরও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। রমেশ তার স্বামী নয় তার স্বামী অন্য কেউ এটা জানার পরেই তার মন আকুল হয়ে ধাবমান হয়েছে তার প্রকৃত স্বামীর খোঁজে। স্মরণে মৃণালিনীর সতীত্বের জয়গাথা তাঁই কমলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য :

আজি তুমি, সতী
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি
নাহি তাতে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা;
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিলিয়া গেছ মোর চিত্ত-সনে।
(পূর্ণতা)
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।

নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সিমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দুরের লেখা
(আহ্বান)

গভীর ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে সতীলক্ষ্মীরূপের এই স্তুতি পত্নীর একনিষ্ঠ কল্যাণী ভাবমূর্তির প্রতি কবির সশ্রদ্ধ আস্থাই ব্যক্ত করে। ত্রিমিত্রসুদন বলেন্দ্র-মৃণালিনী সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির যে বহিঃপ্রকাশ 'নষ্টনীড়' গল্পে খুঁজে পেয়েছেন তা 'স্মরণ'-কাব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সঙ্গতিপূর্ণ নয় মৃণালিনীর আদলে কমলার চিত্রায়নের সঙ্গেও। রূপবান কবিশ্রেষ্ঠের প্রেমে পড়ে মৃণালিনী তাঁর জীবনে আসেননি, এসেছিলেন বিবাহের পাকেচক্রে। স্বামী 'রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেই পড়ে উঠেছে তাঁদের সম্পর্ক, সংসারের মঙ্গলঘটে নিত্য ঢেলে গেছেন অমৃতমাধুরী। কমলার কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্বামী নলিণাক্ষ, নলিণাক্ষর রূপ-গুণ কমলার প্রত্যাশার কলসকে পূর্ণ করে উপচে দিয়েছে।

৪

ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্ত প্রভাতে একমুঠো অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিক্কন-কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

(জীবনস্মৃতি, মৃত্যুশোক)

মায়ের মৃত্যুর স্মৃতি এমন গভীর সুগন্ধ নিয়ে বহমান ছিল কবির অন্তরে। কাদম্বরীর আগে যে নারী তাঁর জীবনে মাধুর্যের রেখাপাত ঘটিয়েছে তিনি অবশ্যই তাঁর মা সারদা। মায়ের টুকরো টুকরো হলেও গভীর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলায়'। জীবনস্মৃতিতে দেখি তিনি রাসিয়ানদের আক্রমণের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে স্বামীর কুশল সংবাদ নেবার জন্য কনিষ্ঠপুত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন। মায়ের সৌজন্যে তাঁর সেই প্রথম পত্ররচনা যদিও সে সারস্বত চর্চায় সরস্বতীর জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করার গন্ধ ছিল। লক্ষণীয়, সমসাময়িক বিশ্বের ঘটনা প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু খবর ছিল বলেই এই উদ্বেগ। হিমালয় থেকে ফেরার পর 'মায়ের ঘরের সভায়' একটা বড়ো আসন দখল করার খবর খুব তৃপ্তির সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাড়ির কনিষ্ঠ বধূ'র কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মায়ের ঘরে বিশিষ্ট স্থান অর্জনও যে রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'ছেলেবেলা'য় এই সভায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তি ও স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় :

সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজগামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল।

শুধু গান গেয়ে ভোলানো নয়, মাকে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন জ্ঞানে, শ্লোক আবৃত্তিতে:

"এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি; শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবীর থেকে ন কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মিকী-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বার-বিসর্গ-যুদ্ধ। মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।"

তবে একথা ভাবা ভুল যে রবির সঙ্গে তার মার সমস্ত বিনিময়েই নিছক সভার বস্তু ছিল। এ সম্পর্কে আন্তরিক স্পর্শের জায়গাও বেশ কিছু রয়েছে। স্কুল-পালানো, পড়া-এড়ানো ছেলে পড়ায় ফাঁকি দেবার জন্য অসুস্থতার ভান করে পেটে ব্যথার অজুহাত দিতেন। মা বুঝতেন সবই, প্রশয় হাস্য মনে মনে হেসে সেদিনের মতো রেহাইয়ের ব্যবস্থা করতেন। ছেলের উৎপাতে সাড়া দিয়ে তাস খেলা ফেলে ছেড়ে দিতেন তাঁর খুড়িমা তথা রবির দিদিমাকে গল্প শোনানোর জন্য। এ সব মধুর অভিজ্ঞতা ঢুকে গেছে 'অসম্ভব কথা' গল্পে।

"মা বলিলেন, "রোস বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি? আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদিমাকে গল্প বলতে বলো না'। মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।'

'ছেলেবেলা' আর 'অসম্ভব কথা'র ভাষা ও যেন প্রায় এক হয়ে আসে। বোঝাই যায়, গল্পের মধ্যে মাকে পাবার বাসনা জেগেছে লেখকের।

রবি শুতে যেতেন মার ঘরে। 'ছেলেবেলা'র বাড়ীতে যাত্রাপালার বর্ণনা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন নটার সময় 'বাজপাখির মতো' শ্যাম এসে জানায় 'মা ডাকছে, চলো শোবে চলো'। এখানেও মার স্নেহময়ী সহযোগের একটি উল্লেখ আছে, 'মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন।'

তবু বহু সন্তানের মধ্যে বেড়ে ওঠা রবির মাকে আরো বেশি করে পাবার ইচ্ছে কাজ করতোই। জগদীশ ভট্টাচার্যর মতে ছিন্নপত্রের চিঠিতে যেন উপমানে তারই প্রকাশ :

> 'অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ওই আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে আদিমকালের কথা ভাবছেন—আমার দিকে তেমন লক্ষ করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।

এই অতৃপ্ত আকাঙ্খা একপ্রকার চরিতার্থ করানোর জন্য তিনি ক্ষেমংকরী চরিত্রে নিয়ে এসেছেন তাঁর মাকে। ক্ষেমংকরীর মতো স্বামী বিচ্ছিন্না না হলেও যথেষ্ট একাকিত্বের মধ্যেই কেটেছে তাঁর দিন, স্বামী দেবেন্দ্র পিতৃঋণ শোধ করার পর থেকেই প্রায় সংসার থেকে একটু দূরত্বে আধ্যাত্মিকতায় বসবাসকারী মানুষ। নামের ক্ষেত্রে তাঁর পিতামহী ও তাঁর স্তনদাত্রী দাসীর নামের আদলটাই তিনি সম্ভবতঃ ব্যবহার করেছেন যা উভয়তঃই দিগম্বরী। পিতামহ ও পিতামহীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বর বিষয়টিও হয়তো ক্ষেমংকরী ও তাঁর স্বামীর তিক্ত সম্পর্কের মধ্যে ছায়াপাত ঘটিয়েছে। যাইহোক, গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে রবীন্দ্রনাথ নলিনাক্ষরূপে একা পেয়েছেন

তাঁর মাকে। একমাত্র পুত্র নলিনাক্ষর প্রতি তার মার স্নেহ, মমতা, উদ্বেগের একচ্ছত্র প্রবাহ রবীন্দ্রনাথকে যেন আরো বেশি করে মাকে পাবার সাধ মিটিয়ে দিয়েছিলো।

সারদা দেবী তেমন শিক্ষা না পেলেও নিজে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের ঋজুপাঠ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তা শোনার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সারদার এই গুণগ্রাহিতার ছবি আমরা ক্ষেমংকরীর মধ্যেও পাই। হেমনলিনীর সঙ্গে নানান বৌদ্ধিক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হেমনলিনী বিস্মিত :

কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমংকরীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য হইয়া যাইত; ইংরাজি না শিখিয়া যে এমন বুদ্ধিবিচারের সহিত চিন্তা করা যায় হেমের তাহা ধারণাই ছিল না।

সৌন্দর্যের প্রতি সারদা দেবীর মুগ্ধতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর মেজ পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখছেন, 'আমার শাশুড়ী বিকেলে মুখ হাত ধুয়ে তক্তপোষের বিছানায় বসে দাসীদের বলতেন অমুকের ছেলে কি মেয়েকে নিয়ে আয়। তারা কোলে করে থাকত, তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতেন, নিজে বড় একটা কোলে নিতেন না। যারা সুন্দর তাদেরই ডাকতেন, অন্যদের নয়।

(নির্বাসিত রাজপুত্র : কবিমানসী ১)

এবার 'নৌকাডুবি'তে এই প্রসঙ্গেই ক্ষেমংকরীর কার্যকলাপে আসি। সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়।

'সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। দশাশ্বমেধঘাটে প্রাতঃস্নান সারিয়া পথে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় এক-একদিন কোনো হইতে হয়তো একটি সুন্দর খোট্টার ছেলেকে অথবা কোনো ফুটফুটে হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বাড়িতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন।'

রবীন্দ্রনাথের অভিজাত, শয্যাশায়িনী মা এবং নলিনাক্ষর চলনক্ষম, তুলনায় সাধারণ পরিবেশে থাকা মার আপাত পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু স্বভাবের চয়নগত দিকের মিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অন্তর্লীন প্রক্রিয়াকে গোপন রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কুস্তির পর মাটি মাখার অভ্যাস তাঁকে উদ্বিগ্ন করতো ছেলের রং তামাটে হয়ে যাবে না তো! রবিকাকার রং নিয়ে 'কর্তাদিদিমা'র দুশ্চিন্তার কারণ অবনীন্দ্রও সকৌতুকে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন সর, ময়দা মাখানোর কথা! রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও তাঁর বিশেষ প্রসাধনী উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর লেখাতে পাই : "আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ি ননদ সকলেই গৌরবর্ণা ছিলেন। প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ি আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে সাফ করবার চেষ্টা করতেন," লক্ষণীয়; নলিনাক্ষকে হেমনলিনী সম্পর্কে তাঁর পছন্দের কথা বলতে গিয়েও ক্ষেমংকরী একটা কথা কিন্তু শুনিয়ে দিয়েছেন—রঙটা তেমন ফর্সা নয় বটে!

নলিনাক্ষর মধ্যে দিয়ে মাকে পাবার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীর জন্য শাশুড়ির স্নেহপ্রাপ্তিরও ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মাও পুত্রবধূ হিসেবে মৃণালিনীর মতো সতীলক্ষ্মী গৃহিণীকে

পেলে যে বিশেষ আনন্দ পেতেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কমলা ও ক্ষেমংকরীর অতিনিবিড় সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই না হওয়া ঘটনাকেই রূপদান করেছেন।

নলিনাক্ষ অপূর্ব বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মসমাজের সংগঠক হিসেবে। আগেই বলেছি, নলিনাক্ষর এই বাগ্মিতা আমাদের শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। এই শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালারই 'অভাব' বক্তব্যের দিকে তাকানো যাক যেখানে উপমান হিসেবে আবারও দেখা দিয়েছেন মা। ছিন্নপত্রের সঙ্গে তফাৎ এটাই যে এখানে মার উপস্থাপনা আরো প্রত্যক্ষ, মা স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে :

"আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গাধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, "তুমি এসেছ!"

এরপর রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে প্রবেশ করবেন ধীরে ধীরে। কিন্তু এর মধ্যেই সেই মাতৃহীন বালককে দেখে নিলাম আমরা যা তাঁর ভিতরে থেকে গিয়েছিল। এই বালকই তাঁকে দিয়ে ক্ষেমংকরীকে সৃষ্টি করায়। এই বালকই তাঁকে দিয়ে গান লেখায় :

আর আমাকে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি
আমার ব'লে যা আছে, মা, তোমার ক'রে সকল হরো।

৫

রমেশের চিঠি পড়ে বিপিনের স্ত্রী কমলার কাছে জানতে চেয়েছিল সে নভেল লেখে কিনা। নভেল না লিখতে দেখলেও বিধাতাপুরুষ যে তাঁর জীবনকে 'কুলিখিত উপন্যাস' বানিয়ে ছাড়ছেন এমনটিই তার উপলব্ধিতে এসেছিল, তার সঙ্গে কমলার এবং নলিনাক্ষর সঙ্গে হেমনলিনীর মিলন এই কুলিখিত উপন্যাসেরই সার বস্তু মনে হয়েছিল তার। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে কমলার সঙ্গে মিলিয়েছেন নলিনাক্ষকে, রমেশের অন্তরে দিয়েছেন এই দুই নারীকে ব্যথার রতন হিসেবে। এই পাওয়া, না পাওয়াতেই বর্ণিল হয়ে উঠেছে 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। অব্যবহিত আগের উপন্যাস 'চোখের বালি'তে যে কামনা-বাসনার প্রমত্ততা দেখেছি আমরা তা 'নৌকাডুবি'তে একেবারেই অনুপস্থিত। 'নৌকাডুবি'র জল যেন সমস্ত কলুষ ধুইয়ে দিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' লিখেছিলেন মনের কারখানা ঘরে সেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে তৈরি হয় দৃঢ়ধাতুর মূর্তি, 'নষ্টনীড়' ও তাঁর ভাষায় 'নির্মম সাহিত্য'। প্রায় একই সঙ্গে লেখা এ দুই দহনজ্বলার কাহিনীর পর 'নৌকাডুবি' যেন ব্যক্তিগত শোকের পারাবারে স্নিগ্ধ অবগাহন। 'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। ভাগ্যের তথা স্বামীর কাছে নিদারুণ আঘাত পেয়েও ক্ষেমংকরী সুস্থ জীবনের প্রতি ঈর্ষাতুরা নন। কখনো হেমনলিনী, কখনো কমলার সঙ্গে ছেলেকে মিলিয়ে দেওয়ার ভাবনাই মনে কাজ করেছে তাঁর। হয়তো কমলার প্রতি তাঁর পক্ষপাত একটু বেশি, পত্নীশোকে আচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথও বোধহয় 'নৌকাডুবি'তে তাই-ই। কমলার ভুলের তিনমাসকে তিনি অনায়াসে মেনে নেবেন-এই বিশ্বাস নলিনাক্ষর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে।

নলিনাক্ষর শুদ্ধস্বত্বতা তো প্রশ্নাতীত, রমেশের রোমান্টিক শুদ্ধতাও নেহাৎ মাত্রায় কম নয়। কমলাকে যখন নিজের পত্নী হিসেবে জানতো তখনো ধীরে ধীরে একটি নাবালিকা নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক তৈরি করে তারপর বিবাহের সার্বিক চরিতার্থতায় পৌঁছতে চেয়েছে সে। 'মণিহারা'র ফণিভূষণের মতোই সেও একজন ব্যতিক্রমী স্বামী যে স্ত্রীকে নিছক কামনা-বাসনা চরিতার্থতার বস্তু বলে ঠাওরায় নি। কিছুটা কৌতুকাবহ লাগলেও তার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বতন্ত্রতা 'নৌকাডুবি'র সার্বিক সজল-শুচিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। চক্রবর্তী পরিবারও তাই একটু ভিন্ন প্রেক্ষিতে তার মতো স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্য যে কমলা বেঁচে গেছে এমনটিই মনে করে।

যে দ্বীপটিতে দুর্ঘটনার পর রমেশ ও কমলার দেখা হয় তার বর্ণনাটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো উর্দ্ধমুখে শয়ান রহিয়াছে। 'শুভ্রতা' ও 'শিশুত্ব' এই দ্বীপটিকে এক নিষ্পাপ চেহারা দিয়েছে, 'দুই শাখাবাহু' যেন পরমস্নেহের আশ্রয়স্থল। এই প্রেক্ষাপটে রমেশ যখন রোদনসিক্তা কমলাকে বুকে টানে তখন কামনার বদলে সস্নেহ নিরাপত্তার ছবিই ফুটে ওঠে। 'নিদ্রাবিহ্বল' রমেশের বুকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা কমলার যে ছবি সকালের রোদে ফুটে ওঠে তা মৃত্যুর পাণ্ডুরতা থেকে জীবনের নিরাপত্তায় ফেরার ছবি। 'চোখেরবালি'র songs of experienceর পর কী রবীন্দ্রনাথ আবার আনলেন songs of innocence যেখানে কোমল, স্নিগ্ধ হৃদয়বৃত্তির লালন ও সঞ্চালনে জীবনের গরিমা ফুটে উঠেছে, কামনা প্রমত্ততা তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না। দাম্পত্যে কালিদাসপন্থী কবি কালিদাসের মতোই শরতে দেখেছেন দাম্পত্যের মাধুরীকে। রমেশ-কমলা সম্পর্কের নিবিড় ঝোঁকগুলি তাই শুধু শরতের অমল আলোয় বাঁধা থাকে :

"এই শরৎ মধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে কামরার ভিতর হইতে যখন ক্ষণে ক্ষণে কমলার স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্য রমেশের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল তখন তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। সমস্তই কী সুন্দর, অথচ কী সুদূর! রমেশের আর্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন!"

অন্যদিকে রমেশ হেমনলিনীর সম্পর্ক বয়ে গেল বাদলের শ্যামল বিরহে :

'যে বাতায়নে রমেশ একদিন হেমনলিনীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষান্ত বর্ষণ শ্রাবণদিনের সূর্যাস্ত-আভায় দুটি হৃদয়ের নিঃশব্দ মিলনকে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল, সেই বাতায়নে আর কি সূর্যাস্তের আভা পড়ে না?"

আমাদের মনে পড়ে 'গোধূলি গগনে মেঘে" গানটির কথা। "আর কি কখনো কবে/এমন সন্ধ্যা হবে/জনমের মতো হায় হয়ে গেল হারা" আমাদের মনে পড়ে 'একরাত্রি' গল্পে প্রলয় রাতে নীরবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুজনকে। এই নীরব, অমল মাধুরীর অন্বেষণেই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা বৈশিষ্ট্য। এই অমল মাধুরীর অপমান নীরবে সইতে সইতে একদিন ফেটে পড়েন, 'মালঞ্চ'র রবীন্দ্রনাথ, "নীরজা'র রবীন্দ্রনাথ, বৌঠানের রবীন্দ্রনাথ।

রমেশ সংসারে দুই রমণীকে 'হৃদয়ের মধ্যে' গ্রহণ করেছিল। বাইরে হারিয়েছিল দু'জনকেই। কিন্তু কোনো পুরুষের জীবনে মহেন্দ্রর দখলদারিতে না গিয়ে কেমন করে জীবনশিল্পের 'সুষমায় থেকে যেতে পারে দুই নারী? এর উত্তর পেতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে "শেষের কবিতা"র কালে, যতিশংকরকে বলা অমিত রায়ের কথায় :

একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।

হয়তো এটাই রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যে কাদম্বরী ও মৃণালিনীর সমন্বয় সূত্র।

যে বইগুলির সাহায্য নিয়েছি ঃ—

'কবিমানসী' ১ ও ২ খণ্ড । জগদীশ ভট্টাচার্য (ভারবি)
'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ' । তপোব্রত ঘোষ (দে'জ)
রবীন্দ্র উপন্যাস ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। ভূদেব চৌধুরী (দে'জ)
মৃণালিনী। বিশ্বভারতী সংকলন
লিপিকা। বিশ্বভারতী
ছেলেবেলা। বিশ্বভারতী
জীবনস্মৃতি। বিশ্বভারতী
সম্পর্ক কবি ও কবিপত্নী। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (মিত্র ঘোষ)

আগামী 'প্রাবন্ধিক' পত্রিকার জন্য যন্ত্রস্থ